বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মন্মথ রায়ের কৃতিত্ব ও দান

মন্মথ রায় রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা পৌরাণিক ও একাঙ্ক নাটকের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মঞ্চনাট্য, চিত্রনাট্য, বেতারনাট্য ও রেকর্ডনাট্যসর্বপ্রকার নাট্যরচনাতেই তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। বাংলা নাট্যজগতের অবিসংবাদিত নেতার আসনে তিনি অধিষ্ঠিত। তিনি আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিপূর্ণ আত্মিক যোগ রেখে চলেছেন আমৃত্যু। রচিত নাটকগুলির মধ্যে তিনি চিরকাল প্রগতিমূলক চিন্তা ও আদর্শের রূপায়ণ করে গেছেন। কৃষক, শ্রমিক, অবজ্ঞাত উপজাতীয় লোক প্রভৃতি তার বহু নাটকে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। বর্তমান সমাজের বিষময় ব্যাধিগুলি তিনি বারংবার তুলে ধরেছেন তার নাটকের মধ্যে। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারত তথা বাংলায় মহাজন, জমিদার, মিলমালিক, অসাধু ব্যবসায়ী প্রভৃতির অমানুষী শোষণ ও নির্মম প্রবঞ্চনাও প্রকাশ পেয়েছে তার নাটকে। তাঁর গঠনমূলক, সমাজকল্যাণময় দৃষ্টি সজাগ ও সচেতন থেকেছে চিরকাল। আলোচক অজিতকুমার ঘোষ মন্মথ রায় সম্পর্কে বলেছেন, *"তিনি কখনও আঘাতে কঠোর, কখনও বা ভবিষ্যতের সোনালি স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সর্বত্র একসমাজের পরিপূর্ণ মুক্তি ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ।"*

প্রথম যৌবনে 'বঙ্গে মুসলমান' নামে এটি পাঙ্ক নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার হিসাবে মন্মথ রায়ের আবির্ভাব। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এ নাটকের মূল প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম। প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চসাফল্য পায়নি। তবে পাঠ্য নাটক হিসাবে 'মুক্তির ডাক' বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশংসা পেয়েছিল। পরবর্তী দুটি নাটক ‘চাঁদ সদাগর’ (১৯২৭) এবং 'দেবাসুর' (১৯২৮) অবশ্য যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল এবং নাট্যকার হিসাবে মন্মথ রায়ের প্রতিষ্ঠাও এনে দিয়েছিল।

লৌকিক পুরাণ অবলম্বনে লেখা মন্মথ রায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চাঁদ সদাগর' (১৯২৭)। মন্মথ রায় এ নাটকে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন। তিনি তাই এ নাটকের প্রথম মঞ্চভিনয়ের দিন স্মরণ করেছেন নীলদর্পণ অভিনয়ের কথা। সেদিনের সাধারণ রঙ্গালয়ের বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সাগ্রহে বহন করার অঙ্গীকার করেছেন নাট্যকার।

‘চাঁদ সদাগর’-এর পরবর্তী নাটক 'দেবাসুর'- এও (১৯২৮) পৌরাণিক পটভূমিকে আশ্রয় করেও রাজনৈতিক চেতনারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন মন্মথ রায়। লক্ষণীয় যে, সেযুগে সাধারণত সমকালীন পরাধীন ভারতের যন্ত্রণাকে বাণীরূপ দিতে নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটই বেছে নিতেন। কিন্তু মন্মথ রায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন পৌরাণিক প্রেক্ষাপট। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার জানিয়েছেন,- *"আমি প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের পথে না গিয়ে পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক চিন্তাকে প্রকাশ করার ব্রত গ্রহণ করলাম।"*

পরাধীন ভারতবর্ষে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যমূলক নাটক লেখা সম্ভব ছিল না। তাই ঋগ্বেদের দেব- অসুর বিরোধকাহিনির আবরণে নাট্যকার শুনিয়েছেন ব্রিটিশ-ভারতবাসীর বিরোধকথাই। বৃত্রাসুরের কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় এবং অসুরপতির স্বর্গরাজ্য অধিকার দিয়ে কাহিনির ঘটনা প্রতিস্থাপন। এরপর দধীচির অস্থিনির্মিতবজ্রে

বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গের পুনরুদ্ধার এই নাটকের বিষয়। তবে এই বাহ্য কাহিনির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ব্রিটিশশাসিত ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ; ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বপ্ন। নাট্যকার এ নাটকে দধীচিকে প্রধান চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন।

দেবকুলনারী সূর্যাকে অপহরণকারী অসুরদের হাত থেকে দেবতারা উদ্ধার করার পর দধীচি আশীর্বাদ করে বলেছেন—*"দস্যুর হাত থেকে এই সূর্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি—তেমনি করে উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি।"* আত্মবিসর্জনের মুহূর্তেও তিনি বলেছেন—*"আজ না হয়, এক যুগ পরে সেই এক দেবতার বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে, দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন করবে...সেই আশাতে ... আমি ডুব দিলাম। আমার জাতি অক্ষয় হোক, আমার জাতি অমর হোক, আমার জাতি জয়লাভ করুক।"* এই সংলাপের মধ্যেই স্পষ্ট যে, পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে নাট্যকার আসলে স্বদেশভূমির স্বাধীনতার স্বপ্নকেই বারবার উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। সার্থক নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ ও সংলাপ রচনার দক্ষতায় মন্মথ রায় এ নাটকে উজ্জ্বল। নাট্যসাফল্য ও বিষয়গৌরবে 'দেবাসুর' সমকালের একটি বিশিষ্ট নাটকের মর্যাদা অর্জন করেছে।

এই পর্বে রচিত মন্মথ রায়ের অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'সেমিরেমি' (১৯২৫-মঞ্চস্থ হয়নি), 'কাজলরেখা' (১৯২৬- মঞ্চস্থ হয়নি), 'শ্রীবৎস' (১৯২৯), 'মহুয়া' (১৯২৯) ইত্যাদি। তবে স্বাধীনতা-পূর্বকালে যে নাটকটি মন্মথ রায়কে সর্বাধিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তা এনে দেয়, সেটি হল 'কারাগার'। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার মনমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় 'কারাগার'। এ নাটকের নাট্যদ্বন্দ্বে রয়েছে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ একদিকে অত্যাচারী রাজা কংস, অন্যদিকে বসুদেবের নেতৃত্বাধীন যাদবকুল। অর্থাৎ এই নাটকেরও মূল কাঠামো পরিকল্পনায় রয়েছে পৌরাণিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু এ নাটকেও অন্তর্লক্ষণে অনুসৃত হয়েছে। সমকালীন দেশ-ইতিহাসের সত্য। 'কারাগার'-এর কংস চরিত্র বহুলাংশে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের প্রতিরূপ এবং অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী বসুদেব চরিত্রে পড়েছে গান্ধীজীর ছায়া। নাট্যকার স্বয়ং জানিয়েছেন—*"দেশে তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। দলে দলে লোক কারাবরণ করছিল।...এই পটভূমিকায় মহাভারতে বর্ণিত কংস-কারাগারের কথা আমার মনে এসেছিল। যে কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারেই আজ উদিত হবে আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতা সূর্য।"* এখানে পুরাণের কংস-কারাগারই যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে ব্রিটিশ-শাসিত ভারত কারাগারে। শাসক- শক্তির সমস্ত দমন-পীড়ন নিষ্ফল করে একদিন মুক্তি আসবেই—এই সত্য যেন উদ্ভাসিত হয়েছে 'কারাগার' নাটকে।

'কারাগার' নাটকের এই শক্তিশালী বক্তব্য ব্রিটিশ শাসককে আতঙ্কিত করেছিল। তাই প্রথম অভিনয়ের মাসখানেক পরেই রাজদ্রোহের অভিযোগে নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সরকারি নির্দেশে বলা হয় যে, দেশের বিধিসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে নাটকটি বিরাগ ও অসন্তোষ জাগিয়ে তুলতে পারে। সেজন্য ১৮৭৬-এর নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করে 'কারাগার'-এর অভিনয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

কারাগারের পরে মন্মথ রায়ের লেখা কয়েকটি প্রথাগত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক হল 'সাবিত্রী' (১৯৩১),

'অশোক' (১৯৩৩), 'খনা' (১৯৩৫), 'সতী' (১৯৩৫) ইত্যাদি। এই নাটকগুলির মধ্যেও ইতিহাস বা পুরাণের কিছু আদর্শ চরিত্রকে অনুসরণের চেষ্টা দেখা যাবে।

এরপর মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটকের ধারা থেকে দিক পরিবর্তন করেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন যে, কারাগারের সাফল্যকে অতিক্রম করা তাঁর নিজের পক্ষেই হয়তো অসম্ভব। তাই তিনি এবার অনতিদূর অতীতের ইতিহাস কাহিনি নিয়ে লিখলেন 'মীরকাশিম' নাটক (১৯৩৮)। এখানেও নাট্যকার ব্যবহার করেছেন মীরকাশিমের ইংরেজ-বিরোধিতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। মীরকাশিম চরিত্রটি এখানে সমগ্র জাতির স্বপ্ন ও সংকল্পের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত।

১৯৩৮-এর পর দীর্ঘদিন বাংলা নাট্যজগৎ থেকে মন্মথ রায় অনুপস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা জাপানি বোমার ভয়ে তখন প্রায় জনশূন্য। ফলে সাধারণ নাট্যশালার পক্ষে সেদিন ঘাের দুর্দিন। জীবিকার তাগিদে মন্মথ রায়কেও সরকারি চাকরি নিতে হয় এবং কিছুদিন বোম্বের (অধুনা মুম্বই) চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। নাট্যজগতে তার পুনঃপ্রবেশ ১৯৫২-তে 'মহাভারতী' নাটকের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ মন্মথ রায়ের নাট্যকার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালে। স্বভাবতই এই পর্বের নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব ঘোষণা এবং স্থবির সমাজের সংস্কারসাধন করে নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নরচনাই নাট্যকারের লক্ষ্য।

১৯৫২-তে 'মহাভারতী' নাটকে উপস্থাপিত এক বৃহৎ কালপর্বের রাজনৈতিক ইতিহাস চিত্র। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ১৯৪৭-এর ভারতবর্ষের হাতে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত দীর্ঘ ঘটনাসংকুল অধ্যায়টি চিত্রিত এই নাটকে। মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের মহাভারত নামক এক সম্পন্ন কৃষক ও তার পরিবারকে নিয়ে এই নাটক এক বৃহৎ কালের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। লক্ষণীয়, একালের মহাভারতেরাও পৌরাণিক যুগের প্রতিবাদী চরিত্রগুলির উত্তরাধিকার বহন করছে মন্মথ রায়ের নাটকে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মন্মথ রায় নানা ধরনের সামাজিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু প্রথাগত সামাজিক নাটকের থেকে এগুলি স্বত্ব। কেননা এই সামাজিক নাটকগুলিতেও নাট্যকার এক বিশেষ অভিপ্রায়ের দ্বারা চালিত। মন্মথ রায় বলেছেন— *"দ্বিতীয় পর্বে আমার পরবর্তী (মহাভারতীর পরবর্তী) নাটকগুলি রাজনৈতিক এবং সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর যুক্ত না হয়ে পারেনি, কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাট্যকারের ধর্ম নয়।"*

'জীবনটাই নাটক' (১৯৫২) নাটকে মন্মথ রায় একটি শিল্পী জীবনের আনন্দকে রূপে-রসে অনবদ্য করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমরা সেই নটপুরুষের অভিনয়ে আনন্দলাভ করে মুগ্ধ হই, ক্ষণকালের জন্য শিল্পীকে বাহবা দিয়ে আমাদের কর্তব্য শেষ করি। অথচ আমাদের করতালি-সম্বর্ধিত রঙ্গভূমির অন্তরালে আমাদের লুব্ধ কামনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য দুঃসহ বেদনা সহ্য করে শিল্পীকে যে প্রাণান্তকর সাধনা করে যেতে হয় তার খবর আমরা কেউই রাখি না। মঞ্চশিল্পীর সেই নেপথ্যবর্তী জীবনের হাস্য-করুণ দিকটি আলোচ্য নাটকের মধ্যে উদঘাটিত হয়েছে। মঞ্চের প্রয়োজনে তাদের যে কতখানি সাংসারিক ক্ষতি ও বিপর্য় সহ্য করতে হয় তারও পরিচয় নাটকখানির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

'মমতাময়ী হাসপাতাল' (১৯৫২) নাটকখানির প্রথম অঙ্কে যে কৌতুক রসঘন ঘটনা সৃষ্টি করা হয়েছে, দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে তার রস পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে কুটিল ষড়যন্ত্র জালবিস্তারে ও মহাপ্রাণ চরিত্র দীনদয়ালের দুঃখভোগে নাটকের ঘটনা অতিমাত্রায় গ্লানিজনক ও করুণরসাত্মক হয়ে পড়েছে। মদনপুরে ভুজঙ্গের নিষ্ঠুর চক্রান্ত ও দীনদয়ালের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম মস্তিষ্করিকৃতির মধ্যে দিয়ে ঘটনার যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা নাটকের উপস্থাপনা অংশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ও অতিরঞ্জিত মনে হয়।

'পথে বিপথে' (১৯৫২) নাটকে নাট্যকার বর্তমান সমাজের এক নারকীয় রূপ তুলে ধরেছেন। সমাজের জালজুয়াচুরি, নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা ও বীভৎস নরহত্যার ভয়াবহ চিত্র তিনি দুঃসহ বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে উদঘাটন করেছেন। আনন্দম ক্লাবের নামকরণের মধ্যে দিয়েই নাট্যকার তাঁর শ্লেষটুকু ব্যক্ত করেছেন। মানুষের সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে হরণ করে নেওয়াই এই ক্লাবের সভ্যবৃন্দের একমাত্র ব্রত। অথচ বাইরে আমোদ-প্রমোদ, সৌজন্য ও শিষ্টতার এক একটি প্রতিমূর্তি প্রত্যেকটি সভ্য। আনন্দমের সভ্যগণের তো কথাই নেই, তারা ছাড়াও আছে ভেজালের অসাধু ব্যবসায়ী মহিম, জুয়াচোর ঘটককুলচূড়ামণি প্রজাপতি এবং সর্বাপেক্ষা নৃশংস পাষণ্ড নায়ক স্বয়ং। সে রেস্টুরেন্টের মালিককে ঠকিয়েছে, প্রজাপতির জামা-কাপড় চুরি করেছে, ধাপ্পা দিয়ে মহিমের টাকা আত্মসাৎ করেছে, স্ত্রীর সঙ্গে অমানবিক প্রবঞ্চনা করেছে, জঘন্য নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিজের অসহায় স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিয়েছে, এবং দুটি পতিপরায়ণা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হয়েও পুনরায় তৃতীয় এক নারীর প্রতি নির্লজ্জ অনুরাগ দেখিয়েছে।

'ধর্মঘট' (১৯৫৩) নাটকে নাট্যকার শ্রমিকজীবনের সমস্যাকে খুব কাছ থেকে এবং যথার্থ দৃষ্টিতে দেখেছেন। মালিক ও শ্রমিকের সংঘাত অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। শ্রমিকের সংঘ শক্তি ভেঙে ফেলার জন্য মালিকরা কীভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়ে দেন তাই নাট্য- কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরিশেষে মালিকদের চক্রান্ত সব ধরা পড়ে যায় এবং ধর্মঘটের দাবিতে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধ হয়। ঘটনা সৃষ্টিতে আলোচ্য নাটকে নাট্যকার চমৎকারভাবে নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছেন। জাতিধর্মের সংকীর্ণতামুক্ত শ্রমিক ঐক্য ও মানবতার উন্মেষের মধ্যেই আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত—এটিই এই নাটকে নাট্যকারের মূল প্রতিপাদ্য।

'চাষীর প্রেম' (১৯৫৩) নাটকে বাংলার পল্লিবাসী কৃষিজীবনের চিত্র উপস্থাপিত। 'ধর্মঘট' নাটকে যেমন শ্রমিক সমস্যাকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তেমনি এই নাটকে কৃষিজীবনের বিভিন্ন সমস্যা-জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ, নিত্যকার অভাবের সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম নাট্যকারের সমবেদনাসিক্ত লেখনীতে অভ্রান্তভাবে ধরা পড়েছে। তবু যখন বহু আকাঙ্ক্ষিত মেলার সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যেও আনন্দের চঞ্চলতা জাগে। কৃষক নরনারীর জীবন বহু অপমানে ও আঘাতে লাঞ্ছিত হলেও স্নেহপ্রেমের সম্পদে তারা যে কারো থেকে দরিদ্র নয় নাট্যকার এখানে সেটিই দেখিয়েছেন।

মন্মথ রায়ের একটি কিংবদন্তিমূলক কাল্পনিক নাটক 'আজব দেশ' (১৯৫৩)। এই আজব দেশটি স্থবির, শোষণের পেষণে অন্ধকারময়। সেই অন্ধকারের দেশে আলো নিয়ে আসে কিষণচাদ। অতিসরলীকৃত এ নাটকটি শিল্পসার্থক হতে পারেনি।

কৃষকজীবন নিয়ে লেখা 'লাঙল' (১৯৫৫) মন্মথ রায়ের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। নাট্যকারের মতে যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে কৃষকদের ওপর যে নিষ্ঠুর আর্থিক শোষণ চলেছে, তার প্রতিকারের একমাত্র পথ নিহিত আছে সাম্যবাদী সমাজের প্রবর্তনে।

কখনো কখনো মন্মথ রায় বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য সামাজিক প্রেক্ষাপট ছেড়ে আবার ব্যবহার করেছেন দূর অতীতের ইতিহাসভূমি। সেখানেও অবশ্য তার মূল প্রেরণা দেশপ্রেম। ঐতিহাসিক পটভূমিতে স্থাপিত 'অমৃত অতীত' (১৯৫৯) তাঁর এমনই একটি নাটক। শতবর্ষব্যাপী অপশাসনের অবসান ঘটাতে অষ্টম শতকে গৌড়ের প্রজাবৃন্দ গোপালদেবকে দেশের রাজা নির্বাচিত করে। এ নাটকের একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র কেবল গোপালদেব। ঘটনা সংস্থাপনের নৈপুণ্যে, সংলাপের অসাধারণত্বে 'অমৃত অতীত' মন্মথ রায়ের এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

'বন্দিতা' (১৯৫৯) নাটকে ফুটে উঠেছে সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা দেখাবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্য যেন নাটকের মধ্যে আরোপিত। এর ফলে নাটকের কোনও অনিবার্য সংঘাত ও সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। নাটকের মূল রসনীরব লাঞ্ছনাভোগী বন্দিতার জীবনরহস্যকে কেন্দ্র করেই জমে উঠেছে। এক বঞ্চিতা নারী কীভাবে নিজের মাতৃত্বের অধিকার বিসর্জন দিয়ে নিজের কন্যাকে লালন করেছে, সেই কন্যারই অকারণ ঈর্ষা ও সন্দেহের মর্মান্তিক আঘাত সে কীরূপ নিরূপায়ভাবে সহ্য করেছে তারই বর্ণনার মধ্যে এই নাটকের সব বেদনা, সব রস সঞ্জিত হয়ে আছে।
সমকালীন ঘটনা নিয়ে লেখা মন্মথ রায়ের নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জয় বাংলা' (১৯৭১)। পাকিস্তানের রাজনৈতিক শাসন অস্বীকার করে অনেক রক্তের বিনিময়ে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাহিনি এখানে অঙ্কিত। মন্মথ রায় যে দীর্ঘজীবন ধরে নিজ পরিবর্তনশীল কালকে ধরে রেখেছেন, তার প্রমাণ তার নাটকের বিচিত্র বিষয়গুলিই- 'বিদ্যুৎপর্ণা' (ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক নাটক, ১৯৩৭), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (ইতিহাসভিত্তিক রাজনৈতিক নাটক, ১৯৫৮), 'তারাস শেভচেঙ্কো' (রাশিয়ার বিপ্লবী কবিকে নিয়ে লেখা আদর্শবাদী উদ্দীপনাময় নাটক, ১৯৬৫), 'লালন ফকির' (বাংলার লোককবিকে নিয়ে লেখা সম্প্রীতিমূলক নাটক, ১৯৭০), 'আমি মুজিব নই' (১৯৭১), 'শরৎ বিপ্লব' (শরৎচন্দ্রের জীবনভিত্তিক নাটক, ১৯৭৫), 'এদেশে লেনিন' (১৯৭৮) ইত্যাদি।
নাট্যকার হিসাবে মন্মথ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে ১৯৬৯-এ প. ব, সঙ্গীত-নাট্য একাডেমির পুরস্কার লাভের পর প্রদত্ত ভাষণে। এখানে তিনি বলেছিলেন- *"আমি আমার সব রচনাতেই লক্ষ রেখেছি মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং মানুষের আত্মিক উন্নয়ন। আমি মনে করি, এই যুগসন্ধিক্ষণে আজ যখন আমাদের জাতীয় লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, আমাদের নাটকেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই মহাজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য জমি তৈরি করা।.....আমি মনে করি যে সব সাহিত্যই প্রচার, যদিও সব প্রচার সাহিত্য নয়, রসাে◌ত্তীর্ণ হওয়াই বড়ো কথা।"*